ইউনিট ১

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

পাঠ-১ ঃ প্রাচীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাচীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর সমাজ ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন বাংলার ধর্মের বিস্ড়র বর্ণনা করতে পারবেন।

ইতিহাসে প্রাচীন (Ancient) কাল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগ বা পর্ব। এই পর্বটিতে যে কোনো সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক রূপের কিছু প্রকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন যুগকে তাই কোনো রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সাধারণত ইতিহাসে খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী আগের সময় থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীকেই প্রাচীনকাল বা যুগ বলে ধরা হয়ে থাকে। তবে অঞ্চলভেদে এই সময়ের মধ্যে তারতম্যও লক্ষ করা যায়। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রভাবের কার্যকারিতা নিয়েই এ যুগ বিভাজন নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ভূখন্ডে খ্রিস্টীয় তের শতকের আগ পর্যন্ড় দীর্ঘ প্রায় দুই হাজার বছর সময়কে প্রাচীন যুগ বলে ধরা হয়ে থাকে।

ক. জনবসতি

বাংলায় জনবসতি স্থাপন শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার বছরেরও পূর্ব থেকে। নিগ্রোয়েড, ইউরোপয়েড এবং মঙ্গোলয়েড জাতিগোষ্ঠীর (Race) নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, অ্যালোপাইন, আর্য, মঙ্গোলীয়, শক, তুর্কি, আরব পাঠান, হাবশ, কোচ, রাজবংশী, পর্তুগিজ প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বাংলার জনস্রোতে মিশেছিল। অস্ট্রিকরাই এখানে কৃষি ও পশুপালনের সূচনা করেছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুন্ডা ইত্যাদি জনগোষ্ঠী অস্ট্রিকদের বংশধর। দ্রাবিড়গণ গঙ্গাতীরবর্তী বাংলা অব্দের পরে এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হারে বাড়তে থাকে।

খ. কোম (গোত্র tribe চরিত্রে) সমাজ

দলবদ্ধ জীবনই সমাজ। প্রাচীন বাংলায় কোমই (গোত্র) হচ্ছে সুসংগঠিত প্রথম দলবদ্ধ সমাজ। বিভিন্ন নরগোষ্ঠী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোম জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কোমগুলো একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগ ও আদান-প্রদান তেমন ছিল না। নানা ধরনের বাধা, বিধিনিষেধ ছিল। বিচিত্র এসব কোমের মধ্যে বৃহত্তর কোনো বোধ প্রাথমিক স্ড়রে গড়ে উঠেনি। কোমবদ্ধ সমাজে নিজস্ব সীমিত ভাষা ও সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিল। কোমগুলোর সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা ছিল একান্তই আদিম এবং গ্রামীণ। আদিতে শিকার, কোম কৃষি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পই ছিল সামাজিক সম্পদের প্রধান উৎস। তখন অবশ্য ধনসাম্য প্রথা কার্যকর ছিল। এর অর্থ হচ্ছে শিকার, কৃষি ও গৃহশিল্পে কোমের সদস্যরা ভাগাভাগি (ক্ষুধা নিবারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন) করে নিত। অবশ্য অর্থনৈতিক, সামাজিক আদান-প্রদান রাজনৈতিক কর্মকান্ড, বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে ছোট-বড় কোমের সমবায়ে বৃহত্তর কোমের (বঙ্গ, সুক্ষা, পুন্ডা, কলিঙ্গ, রাঢ় ইত্যাদি) উদ্ভব ঘটেছে। এর ফলে বাংলার সমাজে যেসব 'জনপদ' পরিচয়ে প্রাচীন বিশেষ ধরনের ছোট ছোট আদি রাষ্ট্রে উদ্ভব ঘটেছিল তা বঙ্গীয় প্রাচীন সমাজকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করেছে। কোম যুগের তুলনায় উন্নত কৃষি, গৃহশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য এতে গড়ে উঠেছে। ফলে প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমগোষ্ঠী ক্রমেই বৃহত্তর শংকর বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিস্তার ঘটায় বাংলাদেশ ভুখন্ডে।

গ. জনপদগুলোর সমাজব্যবস্থা

প্রাচীন জনপদগুলোর সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানা যায় না। সে কারণে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া কষ্টকর। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, জনপদগুলো ছিল মূলত কৃষিপ্রধান। তবে এগুলোতে গৃহশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উদ্ভব ঘটেছিল। জনপদগুলোতে রাষ্ট্রের কিছু দায়বদ্ধতা লক্ষ করা যায়। যেমন, দুর্ভিক্ষ হলে রাষ্ট্র বা রাজা-মহাধিরাজাগণ জনকল্যাণের চিন্ড়া থেকে রাজকীয় শস্যভান্ডার থেকে ফসল, শস্যবীজ বিলিয়ে দিত বলে জানা যায়। তবে তা থেকে এটাও আবার মনে করা যায় যে, অভাব ও দুর্ভিক্ষ প্রাচীন জনপদগুলোতে কমবেশি ছিল।

ঘ. প্রাচীন বাংলায় বর্ণ-প্রথা

কোনো সমাজে বর্ণপ্রথা একেবারে শুরুতে থাকে না। এটি সমাজ ব্যবস্থার অনুষঙ্গ হিসেবে সৃষ্টি হয়। আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তার হিসেবেই বর্ণপ্রথা বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর্যপূর্ব ও

অনার্য সংস্কার এবং সংস্কৃতি এ বর্ণপ্রথার ভাবাদর্শে পুষ্ট হয়েছিল। বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের মতোই বাংলা ভূখন্ড বর্ণশ্রম এবং বিভক্তির সর্বগ্রাসী ব্যবস্থায় বেড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এ চতুর্বর্ণের প্রথাকে আরো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের লেখকরা ভূমিকা রাখেন। বিচিত্র সব বর্ণ, উপবর্ণ ও শংকর বর্ণের সামাজিক বিন্যাস এতে গুরুত্ব পায়। এভাবে বর্ণভেদ প্রথা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারে প্রতিষ্ঠা পায়।

ঙ. সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান

প্রাচীন বাংলায় নারী পুরুষের বৈষম্য একটি সাধারণ বিষয় ছিল। তবে ধনী উচ্চকোটি পরিবারের নারীদের অবস্থান পশ্চাৎপদদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। সাধারণভাবে গৌড়ে নারীদের 'মৃদুভাষিণী', 'অনুরাগবর্তী' বলা হতো। বর্ণপ্রথার কারণে অসবর্ণ বিবাহ সমাদৃত ছিল না। তবে উচ্চ পরিবারে তা সবার ক্ষেত্রে মানা হতো না। পাল ও সেন আমলে নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মা ও স্ত্রীদের সম্মান বেশ উঁচুতে ছিল। নারীরা ঘরকন্না ছাড়াও বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিল। অভিজাত পরিবারে শিশু ধাত্রীর কাজেও নারীরা যুক্ত হতো। সুতা কাটা, তাঁত বুনা, অন্যান্য গৃহশিল্পকর্মে নিয়োজিত হতো দরিদ্র পরিবারের নারীরা। সমাজের সাধারণ নিয়ম ছিল নারীপুরুষ নির্বিশেষে একটি মাত্র বিয়ে করা। তবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কিন্তু বৈধব্যজীবন নারীদের জন্য প্রাচীন বাংলায় অভিশাপ হিসেবে ছিল। এ কারণে সহমরণ উৎসাহিত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাকে পিতার বাড়িতে থাকতে হতো, বিধবারা খোরপোষের দাবি ছাড়া তেমন কিছু করতে পারতো না।

অভিজাত পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া করতো। নৃত্যগীতেও দক্ষতা অর্জন করতে দেখা যায় অনেককে। তবে রাজপরিবারেও নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতো না, অবগুণ্ঠন সেখানেও অবধারিত ছিল। কিন্তু হতদরিদ্র ঘরের মেয়েদের শারীরিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হতো, তাই তাদের মধ্যে অবগুণ্ঠনের বাধ্যবাধকতা বা প্রচলন ছিল না।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

বাংলাদেশের কোম সমাজেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আদি ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। মূল কোল (অস্ট্রিক), দ্রাবিড় এবং মঙ্গোল ভাষা-ভাষীদের জায়গা হয়েছিল পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত এলাকায়। এসব অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে লেনদেন, আদান-প্রদান যতবেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ভাষার নৈকট্যও ততটা ঘটেছে। বাংলা ভাষার গঠন প্রক্রিয়া আর্য আমলের পর খিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য শাসনের সময় থেকে একটি নতুন রূপ লাভ করেছে। বিভিন্ন সহোদর ভাষাগোষ্ঠী থেকে গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ায় বাংলা কথ্য ও লিপির উৎপত্তি ঘটেছে। খ্রি. পূর্ব ৫০০ অব্দে আদি ব্রাহ্মলিপির উদ্ভব ঘটেছে। এরপর নানা রূপান্ড়রের মাধ্যমে দশম শতকের দিকে প্রাচীন বাংলা লিপি একটি রূপ লাভ করেছে। এর উপর ভিত্তি করেই পঞ্চদশ শতকে পূর্ণাঙ্গ বাংলা লিপির উদ্ভব ঘটেছে।

সাহিত্যের ভাষা হিসেবে প্রাচীন যুগে বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি সত্য। তবে সংস্কৃতি, নানা রকমের প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষার যে প্রচলন হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে স্বাধীন স্বতন্ত্র গৌড়রীতি, বেদচর্চা, ব্যাকরণ-অভিধান রচনা, সভ্যকবিদের প্রশস্তি রচনা, রামায়ণ কাব্য, চন্ডকৌশিক নাটক, বৌদ্ধাচার্যদের স্তোত্র, সংগীত, মন্ত্র, দর্শন ইত্যাদি রচনাবলি বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

ধর্ম

১. প্রাচীন বাংলার আদি ধর্মসমূহ

আর্যপূর্ব যুগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ১২ শতাব্দীর আগে বাংলার লোকালয়ের বাইরে গ্রাম-দেবতার অবস্থিতি ছিল, নানা ধরনের ধবজা-পুজো ছিল। এ সবই কোম সমাজের পুজো। এ ছাড়া চাষাবাদের সঙ্গেও নানা ধরনের দেবদেবীর পুজো জড়িত ছিল। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি আদি যুগেরই অবদান। প্রাক-বৈদিক যুগে কোমদের অন্যতম ধর্মোৎসব ছিল ব্রত। শিবপূজা, মধুসংক্রান্ড়ি, পৃথ্বিপূজা ইত্যাদি উলে□খযোগ্য ব্রত। কোমদের দেবতা ছিলেন ধর্মঠাকুর। রাঢ়দেশেই ধর্মপূজার প্রচলন ছিল। বাংলার কৃষিজ সমাজে ভাল ফসলের আশায় হোলি উৎসব পালন করা হতো। এ ছাড়া মনসা পূজা, জাঙ্গুলী দেবীর পূজা, পর্ণশবরী শারবোৎসব, ঘটলক্ষ্মী, ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি আর্যপূর্ব কৌম সমাজের অবদান। তবে প্রাক-গুপ্ত যুগে জৈন ধর্ম, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্মের বিস্ড়র ঘটে বাংলার সমাজে। ষষ্ঠ শতকে ব্রাহ্ম বংশের প্রভাবাধীন বৈদিক ধর্মের বিস্ড়র প্রসার ঘটেছিল বাংলাদেশে। পাল যুগে বৌদ্ধ এবং সেন যুগে ব্রাহ্মণ ধর্মের জয়জয়কার অবস্থা বিরাজ করেছিল। এখানকার এসব দেবদেবীর ওপর ভিত্তি করেই ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ধর্ম গড়ে উঠেছিল। এমনকি বৌদ্ধধর্মও এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। এছাড়া পৌরাণিক ধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, শৈব ধর্ম (হিন্দু ধর্মের বিশেষ শাখা) সহজিয়া ধর্মের প্রভাবও কমবেশি বাংলায় ঘটেছিল।

২. ব্রাহ্মণ্যবাদ

আর্যদের বয়ে আনা বিভিন্ন বিশ্বাস, পূজা-অর্চনাকে কেন্দ্র করেই ব্রাহ্মণধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা দেব-দেবীদের উদ্দেশ্য করে মন্ত্রপাঠ করতো, বিভিন্ন ফল, দুধ, ঘি, শস্য, রস, মাংস আহুতি দিত। মূলত দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান করাই ছিল এ সবের

উদ্দেশ্য। কালক্রমে পারিবারিক এসব বিশ্বাস, আবার বলিদান বিশাল আকারে পালিত হওয়া শুরু করে। আর্যদের মধ্যেই এসব অনুষ্ঠান পালনের জন্য পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, অচিরেই বিশ্বাস জন্মে যে দেবতা, পুরোহিত এবং আর্য্য অভিন্ন। যজ্ঞের সূত্র ধরেই সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। এটি লিখিত ছিল না। বহুকাল মানুষ শে-াক আকারে মুখে মুখে যা বহন করে আনে পরে তা ঋগ্বেদ গ্রন্থে ১০০০- এর মত শে-াক গ্রথিত করা হয়। বেদ মানে হচ্ছে 'জ্ঞান'- যার অর্থ হচ্ছে দেবতাদের সমর্থন পাওয়ার বাহন। যে সব পুরোহিত পূজা-অর্চনা থেকে প্রাপ্ত অর্থে অধিক সম্পদশালী হয়ে ওঠেন তারা কালক্রমে সমাজের কাছে রাষ্ট্র, শাসক ও রাজাদের চেয়েও শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তাদের অনেকেই বিশ্বাসের দিক থেকে দেবতার চেয়েও বেশি ক্ষমতার আসন লাভ করে। বলা হতো সূর্য আলো দেবে না যদি পুরোহিত পূজার কাজ সম্পাদন না করেন।' এতে পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণের ক্ষমতাকে দেবতার চেয়েও অধিক করা হয়।

ব্রাহ্মণদের পবিত্র দায়িত্বকে সমাজ, রাষ্ট্রসহ মানুষের জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসে একনিষ্ঠ করার নামই হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদ। এটি একটি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নতুন এ ব্রাহ্মণ্যধর্মের ফলে সমাজে চারটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শ্রেণীভেদ প্রথার ফলে ব্রাহ্মণরা সোনাদানা, দাসদাসী, বস্ত্র, গাভীসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, বৈশ্য ও শূদ্রদের হেয় জ্ঞান করে। এর থেকেই এক সময় ক্ষৈত্রিয়সহ নিম্ন বর্ণের মানুষেরা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পশু বলি ও ব্যয়বহুল পূজাপার্বণের কারণেও অনেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

৩. বৌদ্ধ ধর্ম

মৌর্য সম্রাট অশোকের আগেই প্রাচীন বাংলার কোথাও কোথাও বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়লেও সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষত পুন্ড্রবর্ধনে (বগুড়া-রাজশাহী অঞ্চল) বৌদ্ধ ধর্মের বিস্ড়র ব্যাপকভাবে লাভ করে। বলা হয়ে থাকে, বৌদ্ধদের ষোলজন মহাস্থবিরের মধ্যে বাঙালি স্থবির কালিক ছিলেন তাম্রলিপ্তবাসী। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশ ভূখন্ড ভ্রমণ শুরু করেন। চিনা পরিব্রাজক ফাহিয়েন পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় এসেছিলেন। ৬ষ্ঠ শতকে বাংলার পূর্ব প্রান্ড়ের ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া চীনা বৌদ্ধ শ্রমণ ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভ্রমণ করেছিলেন। তখন বেশ কিছু বৌদ্ধ সংঘয়াম এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাল যুগে (৮ম থেকে ১২ শতাব্দীতে) বাংলাদেশের বৌদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুখ্যাত বৌদ্ধবিহারগুলো ঐ পর্বের বৌদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে। অগণিত আচার্য জ্ঞান-সাধনা এবং গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের অধিকাংশ গ্রন্থই তিব্বতি ভাষায় অনুদিত ছিল।

৪. হিন্দুধর্ম

প্রাচীন বাংলায় সেন যুগে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের স্থান দখল করে নেয়। তবে হিন্দু ধর্ম কোনো একক ধর্ম নয়, এটি অসংখ্য বিশ্বাস, আচার ও আনুষ্ঠানিকতার সমন্বয়ে গঠিত সনাতন ধর্ম। এ ধর্মের বিশ্বাস, আচার ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে স্থান ও কালের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। তবে এতে তিনটি বিষয়ে মিল লক্ষ করা যায়- (১) গাভী ভক্তি, (২) আত্মার পুনর্জন্ম এবং (৩) ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব গ্রহণ করা। হিন্দুধর্ম তিনস্ড়রে দেবত্ব বিশ্বাস করে– (১) স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মা, (২) সংরক্ষক হচ্ছে বিষ্ণু ও (৩) শিব হচ্ছেন ধ্বংসকারী। ভালমন্দের ভারসাম্য রক্ষার যে উদাহরণ দেখা যায় তা মূলত সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যুর মতোই ঘটনা। মানুষ এবং প্রাণীর মধ্যে তেমন বিশেষ পার্থক্য নেই বলে বিশ্বাস করা হয়। কেননা, উভয়েরই আত্মা আছে। এ কারণেই গাভী, সর্প, হাতি, কুমিরসহ অসংখ্য প্রাণীর প্রতি হিন্দু ধর্মের দেবত্বের সম্মান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সেন বংশের রাজত্বকালের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী। বর্মণ বংশের রাজারা ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। অপর দিকে বেদবংশের রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের পাশাপাশি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বোঝা যাচ্ছে ঐ তিন বংশের শাসনকালে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাংলায় একক্ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। মানুষের জাতকর্ম, বিবাহ, সমাবর্তন, নামকর্ম, গৃহপ্রবেশসহ বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে বাঙালি ব্রাহ্মণরা সেন-বর্মণ আমলে জড়িয়ে পড়েন। তারা রাষ্ট্রের সহযোগিতাও পেয়েছিল। নানা বিশ্বাস, বিভাজন, আচার, পূজা, দেবদেবী, লৌকিকতা মিলিয়ে বাংলাদেশ ভূখন্ডে হিন্দু ধর্ম ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যথেষ্ট স্বকীয়তা নিয়ে প্রাচীন যুগের শেষ বছরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রাচীন যুগের বিশ্বাস-আচার-অনুষ্ঠানাদিতে প্রাচীন ধর্মভক্তির প্রভাব পড়ে।

গুপ্ত যুগে (৪র্থ-৬ষ্ঠ) বাংলায় বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মমত প্রচলিত ছিল। পাহাড়পুর মন্দির কৃষ্ণলীলার অঙ্কিত চিত্রের কারণে দর্শনীয় স্থান হয়ে আছে। বাংলার হিন্দু সমাজের কাছে দুর্গাপূজা সার্বজনীন পূজোৎসব হয়ে আছে। এ ছাড়া বৌদ্ধ ধর্মের আমলে রূপান্ড়র ঘটিয়ে সহজিয়া পরিচয় লাভ করেছে। বাংলার আউল-বাউলরা বাংলার সেই সহজিয়া ধর্মেরই ধারক-বাহক। বাংলা ভূখন্ডে প্রাচীন যুগেই এতোসব বিশ্বাস ও আচারে বাঙালির বিশ্বাসের জগৎ সমৃদ্ধ হয়েছে।

জীবনধারা

প্রাচীন বাংলার মানুষ ভাত, মাছ, তরিতরকারি, দুধ, দই, ঘি, খির, মাংস, ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করতো। তখন রান্নাবান্নায় প্রচুর মসলা ব্যবহার করা হতো। গ্রামেগঞ্জে পার্বণে পিঠা, মুড়ির প্রচলন ছিল। খাওয়ার শেষে মসলাযুক্ত, পান

দেওয়া হতো। প্রাচীন যুগেই শুঁটকী মাছ অত্যন্ত জনপ্রিয় খাওয়া ছিল। ব্রাহ্মণরা মাছ মাংস পরিহার করতো, বিধবাদেরও চর্বি জাতীয় খাদ্য নিষিদ্ধ ছিল।

পুরুষদের সেলাইবিহীন ধূতি, নারীদের শাড়ি প্রাচীন বাংলার সাধারণ পরিধেয় ছিল। যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল তারা উত্তরবাস স্বরূপ আর একখন্ড সেলাইবিহীন কাপড় ব্যবহার কতো, নারীরা করতো ওড়নার ব্যবহার। দরিদ্র ও সাধারণ ঘরে এক বস্ত্র পরাটাই রীতি ছিল, মাথা ঢাকার মতো দ্বিতীয় বস্ত্র কেনার সামর্থ্য অনেকেরই ছিল না। যারা ওড়না পরতেপারতো তারা অবগুণ্ঠন হিসেবেও তা ব্যবহার করতো। প্রাচীনকালে শাড়ির বহর যথাসম্ভব বেশি দেওয়ার চেষ্টা করা হতো। নক্সামুদ্রিত শাড়ি ওড়নার প্রচলন বাংলায় ছিল, তবে তা অভিজাত পরিবারের মেয়েরাই পরিধান করতে পারতো। ফকির, দরিদ্র সমাজ, শ্রমিকরা সাধারণত ন্যাঙ্গোটি পড়তো। শিশুরা হাঁটু পর্যন্ড় লম্বা ধূতি, না হয় আঁট পায়জামা পড়তো। সৈনিক ও মল- ধারীরা খাটো আঁট পায়জামা পড়তো।

শিক্ষা-জ্ঞানবিজ্ঞান

প্রাচীন বাংলার শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ, ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্র, প্রাচীনগ্রন্থ ইত্যাদিতে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে প্রাচীন বাংলার কথা তেমন উলে- খ নেই। তারপরও সুদূর প্রাচীনকালে এ দেশে গৃহবদ্ধ, পরিবারবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার একটা সংস্কার ছিল। কিন্তু তাতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় মৌর্য আমল (খ্রি. পূ. তৃতীয় শতক) থেকে। তবে বৌদ্ধ সংঘরাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলোই প্রথম ছোট বড় শিক্ষায়তন হিসেবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন জনপদে গড়ে ওঠা বৌদ্ধবিহারগুলো জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নালন্দার মহাবিহারের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ-৭ম শতকীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠে। পালযুগে বাংলায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়; ঐ সময় চতুষ্পাঠী শিক্ষা গড়ে তোলা হয়। বিদ্যার্থীরা বাংলার বাইরেও লেখাপড়া করতে যেতেন। গ্রন্থরচনা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চা, ধর্মচর্চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলায় আমাদের কিছুটা সাফল্য ছিল।

শিল্পকলা

প্রাচীন বাংলায় বিত্তশালীরা স্বর্ণ, মণি, মুক্তা, হীরা ও বিচিত্র দ্যুতিময় প্রস্তর সজ্জিত নানা অলংকার ব্যবহার করতো। এসবের তৈরিতে কর্মকারের সুনিপুণ কাজ আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এতে অলংকার শিল্পীর উদ্ভব ঘটে। একই সঙ্গে তীর, বর্শা, তলোয়ার, হস্ড়দন্ড় শিল্প, ঘরবাড়িতে কাঠের কাজ কারু ও শিল্পনৈপূণ্য বিস্ময়করভাবে প্রাচীনকালে সৃষ্টি হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতাগুলোই বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত হয়ে বড় বড় অবদান রাখে।

মূর্তিশিল্প

এখানে কাঠ, পাথর, মাটির প্রস্তর ব্যবহার করে মূর্তি তৈরি একটি প্রাত্যহিক ব্যপার ছিল। ধর্মীয় কারণে এসব মূর্তির ব্যাপক প্রচলন ছিল। ফলে এটি একটি কারু ও বাণিজ্যিক শিল্পে পরিণত হয়। একই সঙ্গে মন্দির-প্রতিমা সজ্জাকরণও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

মৃৎশিল্প

রান্নাবান্নাসহ বিভিন্ন কাজে মাটির পাত্রের ব্যবহার এখানে সুপ্রাচীন কালের ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়েছে। কুমোর পেশাটি মৃৎশিল্পের একটিমাত্র দিক। কিন্তু বড় বড় মন্দির, বিহার, প্রাসাদে শিল্পসম্মতভাবেও মৃৎশিল্পের ব্যবহার করা হতো। প্রাচীন বাংলার লোকায়ত শিল্পের অন্যতম প্রধান অভিজ্ঞানই হচ্ছে মাটির কারুকাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.১

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. প্রাচীন যুগে বাংলায় কীভাবে সমাজ গড়ে উঠেছিল?

২. বাংলাভাষার উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছিল?

৩. প্রচীন বাংলায় ধর্মের বিস্তার কীভাবে হয়েছিল?

৪. প্রাচীন বাংলায় শিক্ষা-জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বরূপ কেমন ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. প্রাচীন বাংলার সামজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আলোচনা করুন।

পাঠ-২: প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

ক. প্রাচীন বাংলার কৃষি অর্থনীতি

বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রাচীন জনপদসমূহ মূলতই কৃষি অর্থনীতি-নির্ভর ছিল। কোম থেকে প্রাচীন জনপদ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভবের কালে গ্রামই ছিল অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। মূলত ধান, তরিতরকারি, ফলমূল, ফুল, সরিষা ও আখ চাষাবাদ করে দেশের মানুষকে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। এখানে প্রচুর আখ উৎপাদিত হতো। এ থেকে প্রচুর রস ও গুড় উৎপাদন করে বিদেশেও রপ্তানি করা হতো। এছাড়া গাছগাছালিতে ভরপুর এদেশে ফলফুলের কোনো অভাব হতো না। কাঠও এখানকার মানুষের একটি অর্থকরী সম্পদ ছিল।

কৃষিভিত্তিক দেশ হলেও প্রাচীনকালে জমির কর্তৃত্ব ছিল রাজাদের হাতে। বিভিন্ন ধরনের কর প্রদানের মাধ্যমে এসব জমি ইজারা নেওয়া হতো। দেশের ধর্ম প্রতিষ্ঠানসমূহ করের আওতা থেকে মুক্ত থাকতো। অনেক সময় জমিদার অভিজাত ব্যক্তিরাও রাজসরকারের কাছ থেকে মন্দির, বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার জন্য জমি ক্রয় করতেন। সে ধরনের জমি বংশানুক্রমে গ্রহীতা ভোগ করতে পারতো।

প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতির সমাজ শোষণ বৈষম্যে জর্জরিত ছিল। বিশেষত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ঘটলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিত। অবশ্য অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর অবস্থা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ছিল।

খ. শিল্প অর্থনীতি

কৃষি প্রধান দেশ হলেও প্রাচীন যুগে বিভিন্ন ধরনের শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হতো। বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পের জন্য বাংলা তখনো প্রসিদ্ধি লাভ করে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কোটিল্য (খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে) তার রচিত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে ক্ষৌম, দুকুল, পতোর্গ ও কার্পাসিক এই চার প্রকারের বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বাংলা থেকে প্রচুর সূক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। এছাড়া প্রস্ড়র ও ধাতুশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। পাহাড়পুর এলাকায় মৃৎশিল্পের অসংখ্য পোড়া মাটি ও তৈজসপত্র পওয়া যায়। এছাড়া বিলাসিতার জন্য স্বর্ণ ও মণিমুক্তার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কাঠ শিল্প, হস্ড়িদন্ড় শিল্প, নৌকা শিল্পও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এসব শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে প্রাচীন বাংলায় মাঝি, স্বর্ণকার, সূত্রধর, মণিকার, কর্মকার ইত্যাদি পেশা ও সংঘের সৃষ্টি হয়।

গ. বাণিজ্য অর্থনীতি

প্রাচীন বাংলার অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমেই স্থান করে নিতে থাকে। বাংলায় অসংখ্য নদ-নদী ব্যবসা-বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। দেশের অভ্যন্ড়রে নৌযোগে গৃহশিল্প, হস্ড়চালিত শিল্প বেচাকেনা হতো। ফলে গড়ে ওঠে হাট-বাজার, গঞ্জ ও নতুন নতুন শহর। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে গঙ্গা নদীর মোহনায় গঙ্গে নামক বন্দর ছিল বলে জানা যায়। বিদেশেও জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। তৎকালীন সুবর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ), মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রায় বস্ত্র, মুক্তা, নানা প্রকার গাছপালা চালান যেত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে স্থলপথে আসাম, ব্রহ্মদেশ, চীন, ভূটান, নেপালসহ বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বাণিজ্যের কারণে বাংলার ধনসম্পদ প্রাচীন যুগে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

ঘ. প্রাচীন মুদ্রা

খ্রিস্টপূর্ব চার-পাঁচ শতক আগেই এখানে ছাপকাটা মুদ্রা প্রচলিত ছিল। মৌর্য যুগেও মুদ্রার উলে- খ পাওয়া যায়। কুষাণ যুগের কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছিল। গুপ্তযুগের অবসানের পর নতুন স্বর্ণমুদ্রা চালু করা হয়। দীর্ঘদিন এখানে কড়িরও প্রচলন ছিল। কড়ি গণনা করে দ্রব্যসামগ্রী কেনাবেচা করা যেত। তারপরও প্রাচীন যুগে বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। তবে মুদ্রার যেটুকু ব্যবহার ছিল তার গুরুত্ব কম নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১.২

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক কেমন ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনা কর।

পাঠ-৩ ঃ প্রাচীন বাংলার জনপদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কোম ও জনপদের উত্থান বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

কোম ও জনপদের উত্থান

বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডে প্রাচীন যুগে একক কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যুদয় ঘটেনি। গ্রিস দেশে যেমন পলিস (Polis) পরিচয়ের বিশেষ ধরনের নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল প্রাচীন বাংলাদেশ ভূখন্ডেও 'জনপদ' নামক এক ধরনের খুব আদি প্রকৃতির গ্রামভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। 'জন' (জনগোষ্ঠী)কে কেন্দ্র করেই এক সময় এক এক জায়গায় এক একটি জনপদ, রাষ্ট্র বা রাজবংশের উত্থান ঘটেছিল। এক সময় ছোট ছোট কোম (tribe-অর্থে) এখানে গড়ে উঠেছিল। এরা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলেছিল। সমতল ভূমি ও পার্বত্যের অরণ্যাঞ্চলে (সাঁওতাল, গারো, কোচ, রাজবংশী ইত্যাদি) সমাজবদ্ধ সমাজে শাসনক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রথা, দলপতি প্রথা, দন্ডবিধি, অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত ছিল। সমাজের রীতি হিসেবে ধনসাম্য (আহার ও ক্ষুধা নিবারণে সকলের সমান ধন ভোগ করার অধিকার) ব্যবস্থাও চালু ছিল। ধারণা করা হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৫ম শতকে কিংবা এর কিছুকাল আগে থেকেই কৌমতন্ত্র ধীরে ধীরে (হঠাৎ নয়) রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হয়েছে। জনপদ হচ্ছে কৌমতন্ত্র থেকে আদি রাজতন্ত্রে উত্তরণের একটি বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা। কোমসমূহের পরিচয়েই জনপদসমূহ পরিচিত হয়েছে। প্রতিটি কোম যেমন আলাদা ছিল, প্রতিটি জনপদও আলাদা এবং স্বাধীন ছিল। তাদের নিজস্ব শাসক ছিল। জনপদগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটির সীমানা বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডের অভ্যন্তরে, আবার কোনো কোনোটির ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিহার, উড়িষ্যা, আবার কোনো কোনোটি উভয় অংশেই ছিল। খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শত বছর আগে থেকে খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতকে বিরাজমান এ ভূখন্ডের জনপদগুলোর মধ্যে পুন্ড্র, গৌড়, বঙ্গ, রাঢ়, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ উল্লেখযোগ্য। যেমন, পুন্ড্র জনপদকে কেন্দ্র করে ৭ম শতকে পুন্ড্রবর্ধন রাজ্য গড়ে উঠেছিল, পরে পাল ও সেন রাজাদের আমলে পুন্ড্রভক্তি নামে তা বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুরকে একত্রিত করেছে।

জনপদ পরিচিতি

(ক) বঙ্গ : বঙ্গ অত্যন্ত প্রাচীন জনপদ। সম্ভবত আর্যযুগের আগে বা শুরুতে (খ্রি. পূ. ১৫০০-৬০০) বঙ্গ জাতি এ ভূখন্ডের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে জনপদ-রাষ্ট্র তৈরি করে। মহাভারতে ও রামায়ণে শক্তিশালী বঙ্গ রাজ্যের কথা উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্গরাজ ও বঙ্গসেনাদের অসীম সাহসের কথা বলা আছে। বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে বঙ্গজনপদ অবস্থিত ছিল। পশ্চিমে করতোয়া নদী, উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হয়েছে। বৃহত্তর বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালির কিয়দংশ নিয়ে বঙ্গ গঠিত হয়েছিল। এখানে যারা বসবাস করত তাদের 'বঙ্গ' জনগোষ্ঠী বলা হত। 'বঙ্গ' থেকে বাঙালি জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

(খ) পুন্ড্র ঃ প্রাচীন বাংলার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদের নাম পুন্ড্র। পুন্ড্র 'জন' বা জাতি এ জনপদ গঠন করেছিল। পুন্ড্ররা বঙ্গসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর নিকটজন ছিল। পুন্ড্রদের রাজ্যের রাজধানীর নাম পুন্ড্রনগর। বর্তমান বগুড়া শহরের অদূরে করতোয়া নদীর তীরে পুন্ড্রনগর অবস্থিত। পরবর্তী কালে এর নাম মহস্থানগড় হয়। সম্ভবত মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রি. পু. ২৭৩-২৩২ অব্দ) প্রাচীন পুন্ড্র রাজ্য স্বাধীনসত্তা হারায়। এ রাজ্যের বিস্তৃতি বর্তমান বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর পর্যন্ত ছিল। পুন্ড্র রাজ্যের উত্তর অংশের নাম বরেন্দ্র, বরেন্দ্রী অথবা বরেন্দ্রভূমি ছিল। রাজশাহী অঞ্চলকে এখনও বরেন্দ্র বলা হয়ে থাকে। ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুন্ড্র ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে পুন্ড্র বর্ধন নামে পরিচিত হয়। গুপ্ত যুগে (৪র্থ-৬ষ্ঠ শতকে) পুন্ড্র নগর ছিল গুপ্তদের প্রাদেশিক রাজধানী। এখানে গুপ্তদের সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা ছিল। পুন্ড্র জনপদে একটি উন্নত নগর সভ্যতা ছিল। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুন্ড্রই ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাজ্য।

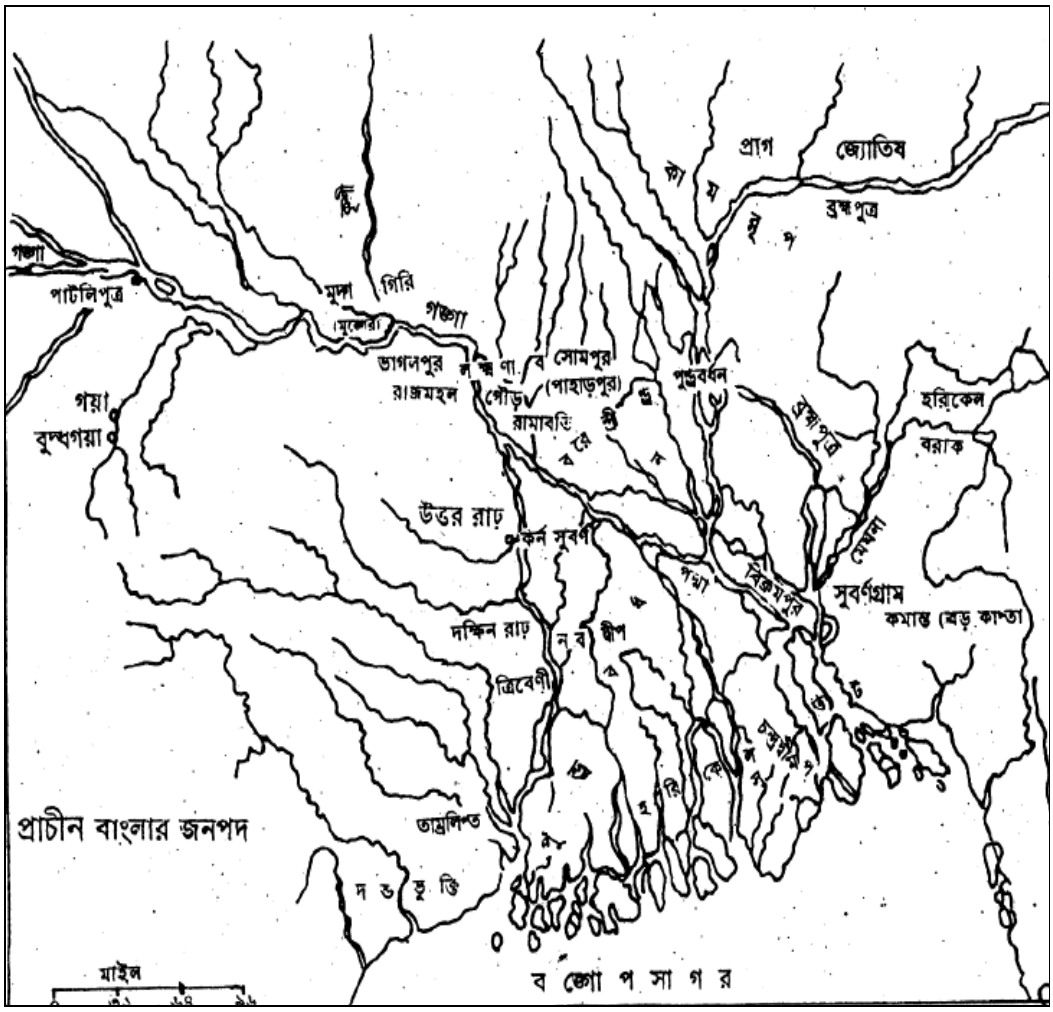

চিত্র ঃ প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ

(গ) গৌড় ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৭৩০ অব্দে মালদহ অঞ্চলে ভোজ বংশীয় গৌড় নামক জনৈক ব্যক্তি (শ্রুতি অনুসারে) যে রাজ্যের পত্তন করেছিলেন কালক্রমে তাই গৌড় রাজ্য নামে পরিচিত হয়। বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে শুরু করে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বহরমপুর এলাকায় এটি বিস্তৃত ছিল। এক কালে এর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড় উলে-খিত অঞ্চলসমূহকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রাজ্যের রাজারা ছিলেন ক্ষমতাবান। গৌড়েশ্বর কথাটি এখনও সেই ক্ষমতারই ইঙ্গিত প্রদান করে। সপ্তম শতকে শশাঙ্কের অধীন গৌড় রাজ্য বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে গৌড়ের নাম লখনৌতি (প্রদেশের নামে) পরিচিতি পায়।

(ঘ) সমতট ঃ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রাচীন জনপদের নাম সমতট। প্রাচীন বঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের নতুন নামের আর একটি বিশাল রাজ্য। মধ্যবাংলার কিছু অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ, বাংলাদেশের বৃহত্তর কুমিল-া অঞ্চল সমতট নামে পরিচিত ছিল। তবে ত্রিপুরাকে সমতটের প্রধান কেন্দ্র বলা হতো। রাজ্য রাজভট্টের (৭ম শতকে) অন্যতম রাজধানী ছিল কর্মান্ত বা ত্রিপুরা (কুমিল-া) জেলার ময়নামতির অদূরে বড়োকামতা।

(ঙ) হরিকেল ঃ প্রাচীন বাংলার অন্যতম আর একটি জনপদের নাম হরিকেল। এটি প্রাচ্যদেশের পূর্বতম সীমানায় অবস্থিত ছিল বলে বিভিন্ন সূত্র ও বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার কারো কারো লিপিতে হরিকেলের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বর্তমান চট্টগ্রামেরও অংশ খুঁজে পাওয়া যায়। আবার কারো কারো লিপিতে হরিকেলের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বর্তমান চট্টগ্রামেরও অংশ খুঁজে পাওয়া যায়। সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে ধরে নেয়া যায় যে, পূর্বে শ্রীহট্ট (সিলেট) থেকে চট্টগ্রামের অংশ বিশেষ পর্যন্ত হরিকেল জনপদ বিস্তৃত ছিল। যদিও মধ্যখানে সমতট রাজ্যের অবস্থিতি ছিল- যা কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি

করতে পারে। আসলে তখন জনপদ বা রাষ্ট্রের কোথাও কোথাও বেশ শিথিল অবস্থা বিরাজ করছিল। তা ছাড়া বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল তিনটি পৃথক জনপদ হলেও এরা খুব নিকট প্রতিবেশী হওয়ায় কখনো কখনো কোনো কোনো এলাকায় অন্য জনপদের প্রভাব বিরাজ করত বলে ধারণা করা হয়। 'ডাকার্ণব' নামক গ্রন্থে হরিকেলকে চৌষট্টিটি তান্ত্রিক পীঠের একটি পীঠ বলা হয়। এখানে নারীদের প্রশংসা করে গ্রন্থ লেখা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, হরিকেলে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। হরিকেলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবও ছিল।

(চ) চন্দ্রদ্বীপ ঃ বর্তমান বরিশাল অঞ্চলে চন্দ্রদ্বীপ নামক একটি জনপদের সৃষ্টি হয়েছিল। মধ্যযুগে চন্দ্রদ্বীপ বেশ সমৃদ্ধ ছিল। পঞ্চদশ শতকে কবি বিজয় গুপ্তের বাসভূমি ছিল ঝালকাঠি অঞ্চলে। তার এলাকা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

"পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘন্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল- শ্রী গ্রাম পন্ডিত-নগর।।
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লীশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়।।"

মনে রাখবে এসব ছাড়াও বাংলা বলে বৃহত্তর অঞ্চলে তাম্রলিপ্ত, দন্ডভুক্তি, রাঢ় (উত্তর, দক্ষিণ) ইত্যাদি নামেও শক্তিশালী জনপদ ছিল। ঐ জনপদগুলো বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডের পশ্চিমে অর্থাৎ ভারতের পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত। তোমরা ভবিষ্যতে প্রাচীন বাংলার সকল জনপদ সম্পর্কে যখন পড়াশোনা করবে তখন বিস্তারিত জানতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১.৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. কোম ও জনপদের উত্থান সম্পর্কে লিখুন।
২. প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর পরিচয় দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর বর্ণনা দিন।

পাঠ-৪ ঃ বাংলায় মৌর্য, গুপ্ত এবং স্বাধীন বঙ্গ ও গৌড়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় মৌর্য শাসনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- গুপ্ত শাসন বিশে- ষণ করতে পারবেন।
- প্রাচীন বঙ্গ ও গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা বর্ণনা করতে পারবেন।

মৌর্য যুগে (খ্রিস্টপূর্ব ৩২১-১৮৫ অব্দ) বাংলা

ক. মৌর্যদের পরিচয় ও মৌর্য যুগ

সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে যায়। খন্ড খন্ড ভারতবর্ষ রূপান্ড়রিত হয় সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে। আদি কৌম (গোত্রীয়) সমাজ রূপান্তরিত হয় সামাজ্যে। ঐ চতুর্থ শতাব্দীতে (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে) মহান আলেকজান্ডার মেসিডোনিয়া থেকে ভারত আক্রমণ করেন। বর্তমান উড়িষ্যাকে তখন মগধ বলা হতো। পাটলিপুত্র এর রাজধানী ছিল। মগধের সম্রাট ধননন্দ ছিলেন নন্দবংশীয়। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যাচারী রাজা। তাকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে পরাজিত করেন। চন্দ্রগুপ্ত গ্রিকদের আক্রমণ শুধু প্রতিহত নয়, তাদেরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করেন। তার নামানুসারে ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা মৌর্য সাম্রাজ্য নামে পরিচিত।

খ. বাংলায় মৌর্য শাসন

মৌর্য বংশের শাসকরা বঙ্গ ও মগধ প্রদেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশ দ্রুত মৌর্য শাসন কবলিত হয়। মৌর্যদের পরাজিত করার মত শক্তিশালী কোনো রাজবাহিনী তখন বাংলায় ছিল না। তবে গ্রিক লেখকদের বর্ণনায় আলোকজান্ডার যখন (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দ) ভারত আক্রমণ করেন তখন বাংলাদেশ ভূখন্ডে গংগরিডাই নামে একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। এখানে পরাক্রমশালী একজন রাজা ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়। সেই রাজার ৪ হাজার হাতিসহ একটি সুসজ্জিত বিরাট বাহিনী ছিল। গ্রিক লেখকদের বর্ণনায় ঐ রাজ্যের রাজধানী নদী উপকূলবর্তী গংগ নামে একটি বন্দর নগরের কথা উলে- খ করা হয়েছে। তাদের লেখা থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ড় গংগারিডাই রাজ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে গংগরিডাই রাজ্য হচ্ছে বঙ্গ রাজ্য। গ্রিক লেখকরা গংগরিডাই উচ্চারণে তা বুঝেছেন।

গ. বাংলার আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থা

মৌর্য রাজবংশ চন্দ্রগুপ্তের (৩২১-২৯৮ খ্রিস্টপূর্ব) হাত দিয়ে শুরু হলেও তার পুত্র বিন্দুসার (খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮-২৭৩) এবং বিন্দুসারের পুত্র অশোকের (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দে) শাসনামলে সাম্রাজ্য চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে অশোকের মৃত্যু পর্যন্ড় ৪০ বছর তিনি ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে প্রাচীন পুন্ড্র রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্ড়র্ভুক্ত হয়। ঐ সময় মগধ (পাটলিপুত্র-রাজধানী) এবং গংগারিডাই মিলে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। পুন্ড্রনগরের রাষ্ট্রভান্ডার মুদ্রা ও শস্যে পরিপূর্ণ ছিল বলে দাবি করা হয়। তবে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্যের দেয়া বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের বীজ ও খাদ্য বিতরণ করা হতো। তাতেই মনে হয়, প্রাচীন বাংলার পুন্ড্রবর্ধন অঞ্চলেও প্রাচুর্য এবং অভাব দুটোই ছিল। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, মৌর্য যুগে বাংলা ছিল ঐশ্বর্যপূর্ণ। বাংলায় মসৃণ সূতিকাপড় তৈরি হতো, এসব কাপড় পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যবংশ দুর্বল হতে থাকে। ঐ বংশের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।

গুপ্তযুগে (৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ খ্রি.) বাংলা

ক. গুপ্ত যুগ ও শাসনের পরিচয়

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘদিন অর্থাৎ প্রায় পাঁচশ বছর কোনো ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা বাংলায় ছিল না। খ্রিস্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৩৫ খ্রি.), তার পুত্র সমুদ্র গুপ্ত (৩৩৫-৩৮০ খ্রি.), পৌত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৩ খ্রি.) ভারতে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় বাংলায় কতগুলো স্বাধীন রাজ্য অবস্থান করছিল। এসবের মধ্যে পুষ্করণ, সমতট, বঙ্গ, ডবাক, পুন্ড্রবর্ধন বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য। পুষ্করণ রাজ্যটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া থেকে ফরিদপুরের কোটালিপাড়া পর্যন্ড় বিস্তৃত ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ রাজ্যের অধিপতি সিংহবর্মা এবং তার পুত্র চন্দ্রবর্মার নাম খোদাই করা লিপিতে উলে- খ আছে। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করে পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেন। বাংলাদেশের পূর্বভাগ ও সমতট সমুদ্র গুপ্তের করদরাজ্য ছিল। সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে বর্তমান আসাম (কামরুপ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের করদরাজ্য রূপে উল্লেখ আছে। 'ডবাক' রাজ্যের পরিচয় সম্পর্কে কেউ কেউ ঢাকা শহরের প্রাচীন নাম বলে উল্লেখ করেছেন, তবে আসামের কপিলা নদীর উপত্যকায় 'ডবোক' থেকে অন্যরা এটিকে গুপ্ত যুগের 'ডবাক' বলে মনে করেন। এছাড়া সমতট জনপদও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্ড়র্ভুক্ত হয়ে পড়ায় ধারণা করা হচ্ছে যে পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাচীন বাংলার বেশির ভাগই ঐ সামাজ্যের অংশ ছিল। গুপ্ত সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তাগণ পুন্ড্রবর্ধন নামক বিভাগ থেকে শাসন করতেন। এমনকি ৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত বংশের সম্রাটের নিজ পুত্র এখানকার শাসনকর্তা রূপে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন।

আবার ৫০৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত পূর্ববঙ্গ তথা সমতটের শাসক ছিলেন বলে জানা যায়। প্রথমে তিনি দক্ষিণপূর্ব বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন, পরে স্বাধীন রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। বৈন্যগুপ্তের রাজধানী ছিল ক্রীপুর। বৈন্যগুপ্তের নামে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

খ. গুপ্ত শাসনব্যবস্থা

গুপ্ত সম্রাটগণ বাংলাকে শাসন করার সুবিধার্থে কতগুলো ভাগে বিভক্ত করেন। 'ভুক্তি', 'বিষয়', 'মূল', 'বীথি' ও 'গ্রাম' নামে এসব প্রশাসনিক ভাগ ছিল। 'ভুক্তি' হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক বিভাগ। সম্রাটের একজন প্রতিনিধি এ সব 'ভুক্তি'র শাসনকর্তা ছিলেন। তেমন দুটি ভুক্তি হচ্ছে পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি (উত্তর বঙ্গ) ও বর্ধমান (প্রাচীন রাঢ়ের দক্ষিণাংশ)। ভুক্তির পরবর্তী প্রশাসনিক বিভাগের নাম 'বিষয়'। এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম বিভাগ। বর্তমান কালের জেলার সঙ্গে এর গুরুত্ব তুলনা করা যায়। বিষয়ের শাসনকর্তাদের 'আযুক্তক', কোথাও 'বিষয়পতি' বলা হতো। ভুক্তির শাসনকর্তাই তাদের নিয়োগ দিতেন। উলে- খযোগ্য 'বিষয়' হচ্ছে-'কোটিবর্ষ বিষয়', 'খোদাপাড়া বিষয়', 'পঞ্চনগরী বিষয়', 'বরাকমন্ডল বিষয়' ইত্যাদি। তবে 'বিষয়' তথা জেলা প্রশাসনে বিভিন্ন পেশার মানুষদের নিয়ে বিভিন্ন উপদেষ্টামন্ডলী ছিল। তারা দলিলরক্ষক, নগরশেঠী (ধনী ব্যক্তি), বণিক, কারিগর, করণিক (কায়স্থ) ইত্যাদি শ্রেণী পেশার মানুষ ছিলেন। পরবর্তী প্রশাসনিক বিভাগের নাম ছিল 'বীথি'। সবচেয়ে ছোট প্রশাসনিক বিভাগ ছিল 'গ্রাম'। গ্রামের প্রধানরাই এর প্রশাসনিক কাজে যুক্ত থাকতেন। গ্রামগুলোতে ভূমিদান, দলিল সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে গ্রাম প্রশাসন যুক্ত থাকত।

গুপ্ত যুগে ভূমি ব্যবস্থা ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। চাষযোগ্য, বাসযোগ্য, অকর্ষিত, খিল (পতিত) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ জমি বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকর ছিল।

বাংলার ইতিহাসে প্রশাসনিক এবং ভূমি ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে গুপ্তদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু ৬ষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহ ও হূণজাতির বার বার আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়লে বাংলায় গৌড় ও বঙ্গ নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে।

স্বাধীন 'বঙ্গ' ও 'গৌড়'- উত্থান

১. পটভূমি

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সেই অস্থিতিশীল পরিবেশে বাংলাদেশে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। এর একটি হচ্ছে স্বাধীন 'বঙ্গ রাষ্ট্র', অপরটি 'গৌড় রাজ্য।

২. স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্র

গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্রের রাজারা তামার পাতে খোদাই করা রাজ নির্দেশ জারি করতেন। এগুলোকে তাম্রশাসন বলা হতো। এ রকম ৭টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। স্বাধীন বঙ্গরাজ্যে চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামের তিনজন রাজার নাম জানা যায়। তারা ৫২৫ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় মোট ৭৫ বছর রাজত্ব করেন। সম্ভবত চন্দ্রগুপ্ত একাই ৩৩ বছর শাসন করেছেন বলে জানা যায়। বঙ্গের রাজাগণ 'মহাধিরাজ' উপাধি ধারণ করতেন। এতে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীন বঙ্গের যথেষ্ট যশ, খ্যাতি, প্রভাব ও সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে দাক্ষিণাত্যের চাণক্য রাজ বংশের রাজা কীর্তি বর্মণ দ্বারা বাংলা আক্রান্ড় হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের নেতৃত্বে বাংলার পুন্ড্র বা পন্ড্রবর্ধন, গৌড় এবং বঙ্গকে একত্রিত করে একটি বিশাল গৌড় রাজ্য স্থাপিত হয়।

৩. স্বাধীন গৌড় রাজ্য

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমকে কেন্দ্র করে প্রাচীন গৌড় রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে। সপ্তম শতকের শুরুতে ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্ক যখন গৌড়ের রাজা হন তিনি আসমুদ্র বিস্তৃত গৌড় রাজ্যের বিস্ড়ার ঘটান। তিনি নিজেকে গৌড়েশ্বর পরিচয় দিলেন। তিনি তার রাজ্য সীমানা পশ্চিমে বারানসী, পূর্বে কামরন্প রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এর পর গৌড় একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। শশাঙ্ক একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্যোগ নেন। তার আমলে তাম্রলিপ্ত বন্দর গুরুত্ব লাভ করে। তিনি ৬৩৭ সালে মৃতুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য শাসকের অভাবে গৌড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গোটা বাংলায় নেমে আসে অন্ধকারের যুগ। প্রায় একশ বছর বাংলার ইতিহাসে যে অরাজকতা, নেতৃত্বের শূন্যতার সৃষ্টি হয় তাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৪

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. স্বাধীন 'বঙ্গ' ও 'গৌড়' এর উত্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলায় মৌর্য ও গুপ্ত যুগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

পাঠ-৫ ঃ বাংলায় পাল ও সেন শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় পাল শাসনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলায় সেন শাসনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বাংলায় পাল শাসন (৭৫৬-১০৪৬ খ্রি.)

চিত্র ঃ পাল সাম্রাজ্য

ক. বাংলায় মাৎস্যন্যায়

৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় অরাজকতা, আত্মকলহ এবং বিদেশী আক্রমণ নেমে আসে। বাংলা বা বাঙ্গাল পুন্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি, সমতট ইত্যাদি অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বণিকরা ক্ষমতা দখলে নেমে পড়ে। একশ বছরে অধিক সময়ের বাংলার ইতিহাসকে মাৎস্যন্যায় (বড় মাছ ছোট মাছ খেয়ে ফেলার রূপক অরাজকতা) বলা হয়ে থাকে। মাৎস্যন্যায়-এর ফলে বাংলার রাজশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। সামন্তপ্রভুরা আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। গৌড়ের শাসন নিয়ে হতাশা, ক্ষোভ ও পরিহাস এ যুগে চরম আকার ধারণ করে।

খ. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের শাসন (৭৫৬-৭৮১ খ্রিস্টাব্দে)

বাংলার ইতিহাসে প্রথম দীর্ঘ চারশ বছরব্যাপী শাসন করেছিল পালবংশ। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল। তার বংশধরগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। গোপালদেবের আদিবাস বরেন্দ্রভূমিতে। গোপালের পিতামহ ও পিতা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সম্ভবত সে কারণেই দেশের অরাজক অবস্থায় অতিষ্ঠ বাংলার সামন্ড় জমিদার এবং প্রজাদের সমর্থনে বরেন্দ্রী ও বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করতে তিনি সক্ষম হন। বাংলায় অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে নতুন এক শক্তিশালী

দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার অমর কীর্তি। এ বংশের ১৭ জন নৃপতি বাংলা শাসন করেন। গোপাল নিজেকে 'পরম সৌগত' আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যথেচ্ছাচারী সামন্ত-জমিদারদের শায়েস্ত্র করেন এবং অনেক জমিদারের সহায়তায় বাংলাদেশে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা গোপাল সমুদ্র তীর পর্যন্ড় বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করেন। অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতটে দেববংশ ৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিল।

গ. ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রি.)

গোপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র ধর্মপাল বাংলার নৃপতি হন। পাল সাম্রাজ্য এবং প্রতিপত্তি বিস্ত্তরে ধর্মপালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাই প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি 'বিক্রমশীলদেব' উপাধি গ্রহণ করেন।

ধর্মপালের শাসনকালে উত্তর ভারতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি রাজবংশ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। এ তিনটি রাজবংশ হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের (১) রাষ্ট্রকুট বংশ, (২) মালব ও রাজস্থানের প্রতিহার বংশ এবং (৩) বাংলার পাল বংশ। ইতিহাসে এটিকে 'ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ৭৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্রথম যুদ্ধটি সংঘটিত হয় প্রতিহার ও পাল বংশের মধ্যে। ধর্মপাল এ যুদ্ধে পরাজিত হন। এরপরই দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা ধ্রুব প্রতিহার-রাজা বৎসরাজকে পরাজিত করেন। তিনি ধর্মপালকেও পরাজিত করেন। তবে ধর্মপাল মগধ, বারানসী ও প্রয়াগ অধিকার করতে সক্ষম হন। ধ্রুব অবশ্য দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল কণৌজ দখল করে নেন। ধর্মপাল সিন্ধু নদ ও পাঞ্জাব পর্যন্ত গমন করেন। তাঁর ৪০ বছরের শাসন সাম্রাজ্য বিস্তার, বৌদ্ধ ধর্মের মঠ নির্মাণ ছাড়াও বাংলায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থিক উন্নতির কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ সময় জনগণের মুখের ভাষা লোকগাথার ব্যাপক প্রচলন হয়। বাংলা ভাষার আদিরূপ তখনই পরিলক্ষিত হয়। কৃষি ও বাণিজ্যের কারণে বাংলা তখন ভারতবর্ষের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে। ধর্মপালের উপাধি 'বিক্রমশীলদেব' অনুসারে নিম্নঙ্গের বর্তমান মুন্সীগঞ্জের নাম তখন 'বিক্রমপুর' রাখা হয়।

ঘ. দেবপাল (৮২১-৮৬১ খ্রিস্টাব্দ)

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবপাল (৮২১ খ্রি.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। দেবপাল ভারতবর্ষের উৎকল, হ্ন, কম্বোজ, গাড়োয়াল, রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার, প্রাগজ্যোতিষপুর এবং সমতটের রাজাদের পরাজিত করেন। এর ফলে সমগ্র উত্তর ভারতে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্য বিস্ত্তরে তার মন্ত্রী দর্ভপাণির কূটনীতি এবং মন্ত্রী কেদার মিত্র মিশ্রের বুদ্ধি বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। তবে বাংলার হরিকেল অঞ্চল তার অধীনতার বাইরে থেকে যায়। পরবর্তীকালে সমতটে চন্দ্রবংশের উত্থান ঘটে।

পালরাজাদের মধ্যে দেবপাল সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে পাল রাজারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চেয়ে বুদ্ধিমত্তা ও কূটনীতির সাফল্যের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিতেন। দেবপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এছাড়া নালন্দায় তিনি একটি বৌদ্ধ বিহারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ঙ. পাল সাম্রাজ্যের অবনতি (৮৬১-৮৯৫ খ্রি.) ও পুনরুদ্ধার

দেবপালের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেই পরিচয় নিয়ে মতভেদ আছে। এখানে পালবংশের উত্তরাধিকার হিসেবে ধারাবাহিকতার পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি ও মতভেদ রয়েছে। তথ্য-প্রমাণের অভাবের কারণে সঠিক ধারণা লাভে এখনো বিভ্রান্ড়ি সৃষ্টি হচ্ছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় আবিস্কৃত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, দেবপালের পুত্র ছিলে মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল। তিনি ৮/১০ বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে। মহেন্দ্রপাল ছিলেন শুরপালের ভাই। মনে হচ্ছে মহেন্দ্র পাল, বিগ্রহপাল সংসার বিরাগী ও শান্ড়িপ্রিয় মানুষ ছিলেন। ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তার পুত্র নারায়ণপালের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে তিনি বাণপ্রস্থ গ্রহণ করেন।

চ. নারায়ণ পাল (৮৬৬-৯২০ খ্রিস্টাব্দ)

নারায়ণ পাল দীর্ঘ সময় বাংলার শাসক ছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় একজন নির্বিরোধী ও ধার্মিক রাজা ছিলেন। প্রথম ১৭ বছর বাংলা ও বিহারে তার রাজত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু এরপর মগধ, কামরস্ডপসহ বিভিন্ন অঞ্চল তার হাতছাড়া হয়। বাংলার মধ্যেই পাল রাজ্যের সীমানা সংকুচিত হয়ে পড়ে। তার দীর্ঘ শাসনকালে দেশে শিল্পকলার উন্নতি ঘটে, অপেক্ষাকৃত শান্তিও বিরাজ করছিল।

নারায়ণ পালের পর তার পুত্র রাজ্যপাল (৯২০-৯৫২ খ্রি.), রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গোপাল (আনুমানিক ৯৫২-৯৬৯ খ্রি.) ক্ষমতায় ছিলেন। ঐ সময় কম্বোজ বংশোদ্ভূত পাল রাজাদের উত্থান ঘটে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায়। কম্বোজ কারা এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও এরা বাংলার পাল রাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত কোনো ক্ষমতাধর গোষ্ঠী হতে পারে বলে অনুমান করা যায়। কম্বোজ রাজা রাজ্যপাল গৌড় ও উত্তরবঙ্গ এবং মেদিনীপুর দখল করেন। দ্বিতীয় গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের (৯৬৯-৯৯৬ খ্রি.) শাসনকালে কলচুরি ও চন্দেল বংশীয় রাজাদের আক্রমণে পাল বংশ বিপর্যস্ড় হয়ে পড়ে।

ছ. মহীপাল (৯৯৫-১০৪ খ্রিস্টাব্দ)

পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অত্যন্ড় দুঃসময়ে বিগ্রহপালের পর তাঁর পুত্র মহীপাল ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনি বিপর্যস্ড় ও 'অনাধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য কম্বোজ এবং চন্দ্রবংশের হাত থেকে বিহার, উত্তর বাংলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বারানসী ও সারনাথ পর্যন্ড় শক্তি বৃদ্ধি করেন। তবে সেই সময় দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে বাংলার স্বাধীনতা প্রায় বিপন্ন হতে বসে। তিনি পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি রাজ্য সম্প্রসারণ ও জনহিতকর কাজ এবং বৌদ্ধ তীর্থ স্থানে কীর্তি স্থাপনসহ নানা কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর নামে 'মহীপাল গীত' প্রচলিত ছিল।

জ. অবনতি, পুনরুদ্ধার ও পাল বংশের পতন

মহীপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্যে আবার অশান্ড়ি সৃষ্টি হয়। তার পুত্র নয়পাল (১০৪৩-১০৫৮ খ্রি.), পৌত্র ৩য় বিগ্রহ পালের (১০৫৮-১০৭৫ খ্রি.) রাজত্বকালে বাইরের শক্তি দ্বারা ক্রমাগত আক্রান্ত হন। শুধু বাংলা নয় বিহারেও পাল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশের অভ্যন্ড়রেও ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বেড়ে যায়। তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০ খ্রি.) উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন। তার মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই শূরপাল দু'বছর (১০৮০-১০৮২ খ্রি.) রাজত্ব করেন। এরপর শূরপালের ছোট ভাই অর্থাৎ মহীপালের ছোটপুত্র রামপাল (১০৮২-১১২৪ খ্রি.) রাজা হয়ে বরেন্দ্র উদ্ধারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। প্রবল যুদ্ধের পর পিতৃভূমি বরেন্দ্রভমি উদ্ধারের পর রামপাল রাজ্যে শান্ড়ি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তার রাজ্যের শেষ দিকে তিনি কামরুপ ও উড়িষ্যাতেও প্রভাব বিস্ড়ার করতে সক্ষম হন। কবি সন্ধ্যাকর 'রামচরিত' নামে রামপালের জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। রামপালকেই পাল বংশের 'শেষ মুকুট' বলে অভিহিত করা হয়। যদিও তার মৃত্যুর পর তার চার পুত্র বিত্তপাল, কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপালের মধ্যে প্রথম দুজন বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সেন বংশের উত্থানের ফলে পাল রাজত্বের অবসান ঘটে।

ঝ. পাল রাজত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

যত সমস্যা ও সংকটই থাকুক না কেন পাল যুগের ৪ শত বছরের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার সীমানা সর্বভারতীয় অবস্থান থেকে আলাদা রাজ্য বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে চিহ্নিত হয়েছে, সেই সীমানায় বসবাসকারী মানুষের মনে স্বতন্ত্র একটি বোধ সুপ্তভাবে হলেও কাজ করতে শুরু করে। আর্যপূর্ব যুগ থেকে জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ও সংস্কৃতির উদ্ভব এ চারশ বছরে একটি রূপ লাভ করে। নিজস্ব ভাষা, অক্ষর রীতি-লিপির উদ্ভব, শিল্পাদর্শ ইত্যাদির ফলে বাঙালি জাতির নিজস্ব ভিত তৈরি হয়। পাল রাজত্ব সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

বাংলায় সেন শাসন (১০৯৮-১২২৩ খ্রি.)

ক. সেন বংশের পরিচয়

সেন বংশের পূর্বপুরুষরা কর্ণাটক থেকে বাংলার রাঢ়ভূমিতে এসে বসবাস শুরু করেন পাল যুগে। সামন্ত সেন সেই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তার বাল্য ও যৌবনকাল কেটেছিল কর্ণাটকে, সেখানে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে রাঢ়দেশে এসে আশ্রমবাসে বসবাস করেন। তার পুত্র হেমন্ত সেন দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে ভ্রাতৃবিরোধ ও সামন্ত বিরোধের সুযোগ নিয়ে রাঢ় অঞ্চলে সামন্ত (জমিদার) হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাংলায় সেন বংশের শাসন শুরু করলেও তাঁর পুত্র বিজয় সেনই বাংলায় সেন বংশের শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

খ. বিজয় সেনের শাসন বিস্তার (১০৯৭-১১৬০ খ্রি.)

পাল শাসনামলের ভগ্নদশার সুযোগ নিয়ে বিজয় সেন (১০৯৭-১১৬০ খ্রি.) মহাধিরাজ উপাধি ধারণ করে বাংলায় সেন শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ৬২ বছর একাধারে শাসন করেন। এই সময় একজন ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ থেকে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি ভোজবর্মকে পরাজিত করে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ দখল করেন। এরপর শূর বংশীয় রাজকন্যা বিলাসী দেবীকে বিয়ে করে তিনি রাঢ়দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। গৌড়ের রাজাকে পরাজিত করে বরেন্দ্রভূমিকে নিজের রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা আক্রমণ করে তাতে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পূর্ব দিকে আসামের একাংশ, পশ্চিম দিকে মগধের একাংশ এবং একিভাবে কলিঙ্গের একাংশ দখল করেন। বিজয় সেন বাংলায় এক অখন্ড রাষ্ট্র শক্তির প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি প্রথম রাজধানী হুগলী জেলার ত্রিবেদীতে এবং দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকার বিক্রমপুরে স্থাপন করেন। বিজয় সেন হিন্দু ধর্মের শৈব মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

গ. বল-াল সেন (১১৬০-১১৭৮ খ্রি.)

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন তার রাজ্যের উত্তরসুরি হন। তিনি রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্রী, বাগড়ি (সুন্দরবন মেদিনীপুর অঞ্চল) এবং মিথিলা তার রাজ্যের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে তাঁর রাজ্য পশ্চিমে মগধ মিথিলা, পূর্বে পূর্ববঙ্গ, উত্তরে দিনাজপুর, দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি বাংলায় গৌড়, নবদ্বীপ এবং বিক্রমপুর ও তিনটি স্থানে শাসনকেন্দ্র গড়ে তোলেন। দিনাজপুরে 'বল্লাল দীঘি', বিক্রমপুরের 'বল্লাল বাড়ি' তার অমর কীর্তির স্বাক্ষর বহন করে। তিনি 'অদ্ভূত সাগর' ও 'দান সাগর' নামক দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষ বয়সে তিনি রাজ্য শাসন ও গ্রন্থ রচনার ভার তার পুত্র লক্ষণ সেনের হাতে অর্পণ করে নিজে গঙ্গাতীরে ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তবে তার শাসনামলে কৌলিণ্যপ্রথা প্রবর্তন, সবর্ণবণিকদের মর্যাদা হরণ করে নিচু জাতিতে পরিণত করা ইত্যাদি কারণে বাংলার সমাজে জাতিভেদ প্রথা তীব্র হয়, জাতীয় বোধ দুর্বল ও বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ঘ. লক্ষণ সেনের শাসন (১১৭৮-১২০৬ খ্রি.) এবং সেন বংশের অবসান

৬০ বছর বয়সে লক্ষণ সেন বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি কামরূপ, কলিঙ্গ ও কাশি জয় করেন। তিনি গৌড় জয় করেন। সমগ্র বাংলায় নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার পর লক্ষণ সেন 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর নামানুসারে গৌড়ের রাজধানী লক্ষণাবতী নেওয়া হয়। তিনি পুরী, বানারসী ও প্রয়াগে বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া তিনি মগধ অধিকার করেন। তিনি ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে গৌড় ও বিক্রমপুর রাজ্য দুটিতে তাঁর পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনকে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। শুধুমাত্র নবদ্বীপটি (নদীয়া) নিজের হাতে রাখেন। লক্ষণ সেন জাতিভেদপূর্ণ শৈব (হিন্দু) ধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। নিজে 'পরমবৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেন। নবদ্বীপে (নদীয়া) তিনি বৈষ্ণবধর্মের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাকের অধীনস্থ জায়গিরদার ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি মগধ আক্রমণ করেন। খলজি নালন্দা ও দন্তপুরের বিক্রমশীলা বিহার ধ্বংস করে বিহার ও গৌড় অভিমুখে যাত্রা করেন। বিহার দখলের পর তেমন প্রতিরোধ ছাড়াই খলজি নবদ্বীপে (নদীয়া) লক্ষণ সেনের রাজ প্রাসাদে উপস্থিত হন। লক্ষণ সেন পূর্ববঙ্গে চলে আসেন। বখতিয়ার খলজি ১২০৩-৪ সালে গৌড় দখল করতে সক্ষম হলেও তিব্বত থেকে তাঁকে বিপর্যস্ত অবস্থায় ফিরে যেতে হয়। ১২০৬ সালে লক্ষণ সেন মৃত্যু বরণ করেন। গৌড়ে খলজির তুর্কির শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ব বাংলায় বেশ কিছুকাল সেন বংশের শাসন ও কিছু কিছু স্বতন্ত্র রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় ছিল। ত্রয়োদশ শতকের পর তুর্কি শাসন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলায় সেন বংশের অবশিষ্ট ক্ষমতার অবসান ঘটে।

লক্ষণ সেনের শাসনামলে শিল্প সাহিত্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। তিনি কবি-সাহিত্যিকদের যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন। এক্ষেত্রে ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রমুখ কবির নাম উল্লেখ করা যায়। লক্ষণ সেন নিজেও পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বল্লাল সেনের অসমাপ্ত বই 'অদ্ভূত সাগর' এর রচনা সমাপ্ত করেন। মধ্যযুগের মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ লক্ষণ সেনের এসব কাজের প্রশংসা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১.৫

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. বাংলার পাল শাসন সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
২. বাংলার সেন শাসনটি কেমন ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. পাল ও সেন রাজাদের শাসনকালের বিবরণ দিন।

পাঠ-৬ ঃ দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার কয়েকটি রাজবংশের শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- দেব বংশের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দক্ষিণ পূর্ব বাংলার কয়েকটি রাজবংশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

ক. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার পৃথক পরিচিতি

গৌড়, বঙ্গীয় এবং পাল রাজবংশের রাজ্য সীমানার বাইরেও বাংলাদেশ ভূখন্ডের কিছু অংশ আলাদা কয়েকটি রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়েছিল। অঞ্চলগুলো বর্তমান নোয়াখালি-কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ জেলা পর্যন্ত খন্ড খন্ড বা ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। রাজবংশগুলো হচ্ছে- দেবরাজ বংশ, হরিকেল রাজ্য, চন্দ্ররাজ বংশ, বর্মরাজ বংশ, কান্দিদেব ইত্যাদি।

খ. সমতট (ষষ্ঠ-সপ্তম শতক)

খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকে সমতট (কুমিল্লা-নোয়াখালি) রাজ্যের উদ্ভব হয়। এ অঞ্চলে যারা শাসন করেন তারা হলেন বৈন্যগুপ্ত (৫০৭ খ্রি.), খড়্গ বংশ (৬২৫-৭০৫ খ্রি.), চন্দ্র (৮৬৫-১০৫৫ খ্রি.) বর্মণ (১০৫৫-১১৪৫ খ্রি.)। বৈন্যগুপ্ত ৫০৭ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে 'দশ আদিত্য' ও 'মহারাজাধিকার' উপাধি ধারণ করে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। কতদিন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন তা জানা যায়নি। তবে সপ্তম শতকের প্রথম দিকে (৬২৫-৭০৫) সমতট অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী খগড় রাজবংশের শাসন চলে। খড়গরা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সমতটে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাদের রাজ্যের রাজধানী 'কর্মান্ত বসাক'- যা বড় কামতা নামক স্থান বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। তারা ত্রিপুরা ও নোয়াখালি পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে সমতটে ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী রাত ও নাথ বংশের দুই সামন্ত রাজার সংক্ষিপ্ত (৬৪০-৬৭০ খ্রি.) শাসনের কথাও জানা যায়।

গ. 'দেব' বংশের শাসন (৭৫০-৮০০ খ্রি.)

খগড় বংশের পর কুমিল-ার গোমতী নদী (প্রাচীন নাম 'ক্ষিরোদা') তীরবর্তী দেবপর্বত (ময়নামতি সংলগ্ন) এলাকায় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেবরাজ বংশের উদ্ভব হয়। দেবরাজারা বাংলার সমতট অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অষ্টম শতকের অন্তত ৫০ থেকে ৬০ বছর এ বংশের চার পুরুষের শাসন ছিল বলে ধারণা করা যায়। এ চার পুরুষ হচ্ছেন শ্রী শান্তি দেব, শ্রী বীরদেব, শ্রী আনন্দ দেব ও শ্রী ভবদেব। এরা প্রত্যেকে পরমেশ্বর, পরমভট্টারকে 'মহারাজাধিরাজ', 'পরম সৌগত' ইত্যাদি উপাধি ধারণ করেছিলেন। এ উপাধিসমমূহ তাদের ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্বের পরিচয় বহন করে। ময়নামতি এলাকার বৌদ্ধ সংস্কৃতির নির্দেশনাদি দেব বংশের সমৃদ্ধি বহন করে।

ঘ. চন্দ্র বংশ (৯০০-১০৪৫ খ্রি.)

ময়নামতি এলাকায় প্রাপ্ত তাম্রশসন থেকে জানা যায় যে, ৯০০ থেকে ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় সমতটে একটি শক্তিশালী বৌদ্ধ রাজবংশের শাসন কার্যকর ছিল। এর নাম ছিল চন্দ্র বংশ। এই বংশের রাজারা হচ্ছেন– (১) পূর্ণচন্দ্র, (২) সুবর্ণচন্দ্র, (৩) ত্রৈলোক্যচন্দ্র, (৪) শ্রীচন্দ্র, (৫) কল্যাণচন্দ্র, (৬) লড়হচন্দ্র এবং (৭) গোবিন্দচন্দ্র। এদের প্রথম দু'জন লালমাই পাহাড়ের রোহিতাগিরি, পরবর্তী বংশধর তথা ত্রৈলোক্যচন্দ্র থেকে বাকিরা ঢাকার নিকটবর্তী বিক্রমপুর রাজধানী গঠন করে রাজ্য বিস্ড়ার করেন। শক্তিধর ত্রৈলোক্যচন্দ্র (৯০০-৯৩০ খ্রি.) হরিকেল (সিলেট) এবং চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল ও এর চার পাশের অঞ্চল) জয় করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রীচন্দ্র (৯৩০-৯৭৫ খ্রি.) রাজা হন। তিন তার বংশের গৌরব আরো বৃদ্ধি করেন। তিনি পূর্বে কামরূপ (আসাম) এবং উত্তরে গৌড়ের ওপর প্রভাব বৃদ্ধি করেন। তার পুত্র কল্যাণ চন্দ্র (৯৭৫-১০০০ খ্রি.) এবং কল্যাণচন্দ্রের পুত্র লড়হচন্দ্রের (১০০০-১০২০ খ্রি.) শাসনকালে চন্দ্রবংশের গৌরব অব্যাহত থাকে। এই রাজবংশের পতন ঘটে। চন্দ্র রাজরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

ঙ. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসকরা

বিভিন্ন তাম্র শাসন ও লিপিতে বর্ণিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ৬ষ্ঠ শতকে বঙ্গে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামক তিনজন রাজা ছিলেন। তবে এ অঞ্চল বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে পৃথকভাবে শাসিত হতো। আমরা ময়নামতি ও বিক্রমপুর অঞ্চলে তার প্রমাণ পেয়েছি। সপ্তম শতকে আবার বর্তমান সিলেট অঞ্চল তার রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনিও একজন বৌদ্ধ রাজা ছিলেন।

চ. কান্দিদেবের স্বাধীন রাজ্য (৯ম শতাব্দী)

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার হরিকেল অঞ্চল (বর্তমান চট্টগ্রাম ও এর আশপাশে) ৯ম শতাব্দীতে কয়েকজন স্বাধীন রাজার শাসনের কথা জানা যায়। এরা হলেন ভদ্রদত্ত, তার পুত্র ধনদত্ত এবং ধনদত্তের পুত্র কান্তিদেব। এদের মধ্যে কান্দিদেবের রাজকীয় উপাধি সম্পর্কে জানা যায়। নবম শতাব্দীতে তার শাসন হরিকেল অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তার রাজধানীর নাম বর্ধমানপুর বলে উল্লেখ থাকলেও জায়গাটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

ছ. বর্ম রাজবংশ (১০৮০-১১৫০ খ্রি.)

দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্ম রাজবংশের উত্থান ঘটে। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জাতবর্মা। বর্মরা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমপুর ছিল তাদের রাজধানী। জাতবর্মার পর তার পুত্র হরিবর্মা রাজা হন। তিনি ৪৬ বছর রাজত্ব করেন। তিনি প্রতিবেশী পালদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে নাগাভূমি ও আসাম পর্যন্ড় ক্ষমতা বিস্তৃত করেন। এর পরে এ বংশের উত্তরাধিকার হিসেবে সামলবর্মা ও ভোজবর্মার নাম জানা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সেন বংশের রাজা বিজয়সেন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা দখল করে নিলে বর্ম রাজবংশের অবসান ঘটে। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশের শাসন এভাবেই শেষ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৬

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১. দেব বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
২. চন্দ্র বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজগুলোর পরিচায় দিন।